দৈনিক ইত্তেফাক 065

তারিখ ... 13 AUG 1989 ... ...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম 3 ...

স্থান-কাল-পাত্র

লুব্ধক

পরীক্ষায় নকল করার অপরাধে যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড ১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে। বোর্ডের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের আভাস দিয়ে পত্রান্তরে এ সম্পর্কে যে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আরো বলা হয়েছে, বোর্ডের উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বলা হয়, চলতি বছরের এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র-ছাত্রী নকল করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে বহিষ্কৃত হয়েছে—তাদের সংখ্যা এস এস সিতে ৪ হাজার ৯ শত ৯৫ জন; এবং এইচ এস সিতে ৫ হাজারেরও অধিক। প্রকাশ, প্রথম পর্যায়ে অভিযুক্ত ও বহিষ্কৃত প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী ও তার অভিভাবকদের কাছে কারণ দর্শানোর নোটিস ছাড়া হবে। তাছাড়া বিশেষ পর্যায়ে প্রয়োজনবোধে বহিষ্কৃতদের বোর্ডের সামনে হাজির হওয়ারও নির্দেশ জারি করা হতে পারে। "আর নকল করব না"—প্রথমবারের বহিষ্কৃতদের নিকট থেকে এমন মুচলেকা গ্রহণ করে তাদের পুনরায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগদানের চিন্তা-ভাবনাও নাকি করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে যে সব ছাত্র-ছাত্রী দুবার বহিষ্কৃত হয়েছে এবং পরীক্ষার হলে কর্মরত পরিদর্শকের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে তাদের বেলায় গৃহীত একাডেমিক পানিশমেন্ট কঠোর হবে বলে আভাস পাওয়া গেছে। অন্যদিকে যারা ৩ বার কিংবা তারও বেশীবার বহিষ্কৃত হয়েছে তাদের আর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ার ব্যাপারেও বোর্ড নাকি চিন্তা-ভাবনা করছে। এ ছাড়াও যে সকল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বহিষ্কৃত হয়েছে, সে সব স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও কারণ দর্শানোর নোটিস দেওয়া হবে। আর পরীক্ষার হলে যে সব পরিদর্শক নকলের সহায়তা করার কারণে বহিষ্কৃত হয়েছেন, আগামী ৩/৫ বছরের মধ্যে তাঁদের আর পরিদর্শকের দায়িত্ব না দেওয়ার বিষয়টিও নাকি উক্ত সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত থাকছে। রিপোর্টে বলা হয়, যশোর বোর্ড পরীক্ষায় নকল রোধের ব্যাপারে ইতিমধ্যে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তার ফলাফল শুভ হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে এখন যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হতে যাচ্ছে—ভবিষ্যতে তা বাস্তব ফল দেবে বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ আশা করছেন।

নিজে কোন সময়ই ভাল ছাত্র ছিলাম না বলেই হয়ত ভালভাবে পাস না করা ও ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আগাগোড়াই একটা দুর্বলতা রয়েছে। এক সময়ে ভাবতাম, যারা ভাল-মন্দ যেভাবেই হোক পাস করে উপরে উঠে যাচ্ছে; তারা সবাই কি ফেলকরা ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে ভাল? অথবা যারা ফেল করল, তারা সবাই কি পাসকরাদের চেয়ে ছাত্র হিসাবে খারাপ? এ প্রশ্নের কোন জওয়াব নাই। কারণ মেধা যাচাইয়ের সঠিক কোন পদ্ধতি এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। একদা যে আই কিউ টেষ্টকে অভ্রান্ত বলে মনে করা হত, অধুনা শিক্ষা বিজ্ঞানীরা বলছেন, তার মধ্যেও অনেক ফাঁক ও ফাঁকি রয়েছে।

কিছুকাল আগে বিদেশী এক ম্যাগাজিনে এ সম্পর্কে যে গবেষণা ফলাফল ও বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছিল, দেখা গেছে সেখানে যে ছেলে আই কিউ টেষ্টে পাস করতে পারে নাই—একাধিক বিষয়ে তারও জ্ঞান, মেধা ও প্রতিভা পাস করা কোন কোন ছেলের চেয়েও ভাল। ওই নিবন্ধেই বলা হয়েছিল, পরীক্ষাটা অনেকটা গড় হিসাবে বাছাই করার মত ব্যবস্থা হ'তে পারে। কিন্তু আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে যে বুদ্ধি, মেধা ও প্রতিভা দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার পরিমাপ হতে পারে শুধু কর্মক্ষেত্রে—পরীক্ষার হলে নয়। বলা অনাবশ্যক যে, নিবন্ধকার হচ্ছেন প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির বিরোধী গ্রুপের একজন। এই গ্রুপ মনে করে, টেষ্ট হিসাবে পরীক্ষা চলতে পারে; কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষার নাম করে ছাত্র/ছাত্রীদের জীবনে পাস-ফেলের মার্কা মারাটা কোনক্রমেই উচিত নয়। বলা হয়, দুনিয়ার বেশীর ভাগ শিক্ষায়তন অধুনা এই অভিমতের দিকেই ঝুঁকেছে।

অন্যদিকে একদল শিক্ষক, শিক্ষাগবেষক ও শিক্ষা বিজ্ঞানী মনে করেন, এমনিতেই এখনকার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পড়াশুনার চেয়ে অন্য কিছু নিয়ে মেতে থাকার প্রবণতা বেশী। এই অবস্থায় এস, এস,সি; এইচ,এস,সি; গ্রাজুয়েশন বা মাষ্টার্স-এর মত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে যদি ফাইনাল পরীক্ষা না থাকে, তাহলে লেখাপড়াতো লাটে উঠবেই, সেই সাথে যাদের আমরা ভবিষ্যৎ নাগরিক বলি—সেই তরুণ সমাজের মেধা ও প্রতিভার বিকাশ হয়ে পড়বে রুদ্ধ। কেন না লেখাপড়ার তথা বিদ্যার অনুশীলন মানুষকে জ্ঞানী-গুণীতে পরিণত করে। পরীক্ষার হার্ডল বা প্রতিবন্ধকতা উঠিয়ে দিলে সেই চর্চা ও অনুশীলনের প্রয়োজন থাকবে না। সুতরাং মানুষের অন্তর্নিহিত মেধা ও প্রতিভার বিকাশও ঘটবে না। তাদের আরো বক্তব্য, একজন শিক্ষিত ও একজন মূর্খ বা নিরক্ষর লোকের মধ্যকার পার্থক্যই প্রমাণ করে যে, মানব জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কত বেশী ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলাই বাহুল্য, উভয় দলের বক্তব্যেই যুক্তি আছে—প্রমাণ দলিলও কম নাই। তাছাড়া উভয়পক্ষের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখলে যে কারো মনে হবে, এই দুইতরফা বক্তব্যের সারভাগ নিয়ে তৃতীয় আরেকটা পদ্ধতি যদি শিক্ষা ব্যবস্থায় চালু করা যেত, তাহলে সেটাই বোধহয় হত সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু সেটা কি সহজে সম্ভব? কিণ্ডারগার্টেন কিংবা মন্টেসরী শিক্ষা ব্যবস্থা যারা চালু করেছিলেন তারা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন চাইল্ড সাইকোলজির উপরে। আমাদের দেশের শিক্ষা কিংবা পরীক্ষা ব্যবস্থায় সবই গুরুত্ব পায়—কিন্তু এই পরীক্ষার্থীদের মানসিকতার বিষয়টা হয় উপেক্ষিত নতুবা গুরুত্ব পেলেও পায় অত্যন্ত কম।

কিন্তু উপস্থিত আলোচনায় এসব তত্ত্বকথা থাক। আজ যশোর বোর্ডের সেই দশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষার হলে নকল ও অসদাচরণের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক যে ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে—তাতে কিন্তু নতুনত্ব কিছু নাই। আগেকার দিনে নকল ধরা পড়লে এই ধরনের শাস্তিই পেতে হত। 'রাষ্টিকেট' কথাটা এখন শোনাই যায় না। তাছাড়া বাংলাদেশ আমলে এসে সেই যে প্রথম দিকে পাইকারী পাস দেওয়া শুরু হল,—এযাবৎ যা কিছু হচ্ছে সে সব তারই পরিণতি। ছাত্ররা শুধু যে নিজেরা নকল করে, তাই নয়, অভিভাবক-শিক্ষক সবাই মিলে নকলে তাদের উৎসাহিতও করে থাকেন। আর এসব ব্যাপার এমন যে, একবার যদি রাশ আলগা হয়, তাহলে তার আর কোন সীমা-পারসীমা থাকে না। আগেকার দিনেও নকল হত—চুপে চাপে। কেননা জানা কথাই, ধরা পড়লে শুধু বহিষ্কার নয়, লেখাপড়ারও ইতি ওখানেই। কিন্তু পরে পাইকারী-পাসের সেই জোয়ারে সকল ব্যবস্থা সকল সিদ্ধান্ত কোথায় ভেসে গেল পাড়ায় পাড়ায় স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার সেই উন্মাদনা—কথায় কথায় স্কুল আর কলেজকে সরকারীকরণের সেই জোশ এবং ঝাঁকে ঝাঁকে পরীক্ষা সেন্টার বানানোর সেই প্রবণতা—বর্তমান অবস্থা একদিনে আসে নাই। যশোরে দশ হাজার, বাদবাকী বোর্ডগুলিতে কত হাজার করে? মোটমাট তাহলে কত দাঁড়াবে? কেন এমনটি হল? কয়টি স্কুল বা কলেজে সঠিকভাবে পড়াশুনা হয়? কয়জন শিক্ষক তাঁর মহান পেশার প্রতি বিশ্বস্ত? কয়জন অভিভাবক চান, সার্টিফিকেটের পাশাপাশি তাঁর ছেলে কিংবা মেয়েটি যেন সত্যিকার মানুষ হয়ে গড়ে উঠে? যাঁরা চান, তাঁরাই সেজন্য কি করেন? বড়জোর একজন ছাত্র কিংবা ছাত্রীর জন্য দু'জন কিংবা চারজন টিউটর নিয়োগ। অথবা কোন নামীদামী স্কুলে/কলেজে যে কোন উপায়ে ছেলে বা মেয়েকে ভর্তি করানো। ব্যস ফেলের জন্য তাহলে দায়ী কে? দায়ী কারা? তাদের কিছুই হবে না—শুধু ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীর উপরে নেমে আসবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। এ বিচার কতটা ন্যায়সঙ্গত?

অধুনা ১ম বিভাগ পেলেই হয় না। উপরের ক্লাসে ভর্তির জন্যও প্রথম বিভাগের ছাত্র/ছাত্রীকেও ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়। অর্থাৎ শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নিজেরাই সন্দিহান, কিংবা নিশ্চিন্ত নন যে, যে ছেলেটি ফার্ষ্ট ডিভিশন পেয়েছে—সে ফার্ষ্ট ডিভিশনের কতটা উপযুক্ত। এই অবস্থাও একদিনে হয় নাই। শিক্ষার মহান পেশা এখন ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সেই ব্যবসায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিই বরং ভাল সার্ভিস দিচ্ছে—দিচ্ছে ভাল শিক্ষা, অনুশীলন, চর্চা সবই যে প্রতিষ্ঠানগুলির ভাল—অন্ততঃ প্রচলিত আর পাঁচটা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে। এই অবস্থায় সার্টিফিকেট নামক তরণীতে ভর করে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবন যে চাকুরী নামক বন্দরে ভিড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছে—এতে-এর বেশী আর কি আশা করা যেতে পারে? সব কিছুই আগের মত রেখে শুধু ফেল আর বহিষ্কারদের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অব্যবস্থারই আরেক নাম হবে নাকি?

আমরা বরাবরই একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে—পরীক্ষা পদ্ধতির বেলাতেও আমরা 'গড়ে হাঁটু পানির' পরীক্ষা এবং হরেদরে পাস-ফেলের পরীক্ষার বিরোধী। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশেই বোধহয় সম্ভব— স্কুল ইন্সটিটিউশন বাদ দিয়ে সরাসরি মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট, গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার, গ্রাজুয়েট কৃষিবিদ বিএড এমএড ইত্যাদি তৈরী করা। মেডিক্যাল স্কুল রয়েছে; কিন্তু সেখানে পাস করে কেউ মেডিক্যাল কলেজে পড়তে পারেন না। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা অনেক আন্দোলনের পরে উচ্চস্তরে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছেন, কিন্তু এই যে এস এসসি আর এইচএসসিতে ঢালাওভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা পাস-ফেলের মহড়া চালিয়ে যাচ্ছে—সঙ্গে সহযোগিতা করছেন একশ্রেণীর অভিভাবক, একশ্রেণীর শিক্ষক, এর অবসান হওয়া দরকার।

অর্থাৎ আমরা চাই, প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষা স্কুল থেকেই শুরু হোক। পরীক্ষা পদ্ধতি হোক আধুনিক। সেখান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী, কৃষি—এ রকম বিষয় ধরে ধরে ছাত্র-ছাত্রীরা এগিয়ে যাক। সার্টিফিকেট পেয়ে যারা হায়ার এডুকেশনে আগ্রহী ডাক্তারী, কৃষি, কারিগরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিজ নিজ বিষয় ধরে এগিয়ে চলুক। তারপর আসুক ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়। লাভ করুক ছাত্র-ছাত্রীরা ডিপ্লোমা—, স্ব-স্ব বিষয়ে। যারা হায়ার এ্যাডুকেশনে আগ্রহী এবং যোগ্য, তারা নিজ নিজ বিষয়ে আরো এগিয়ে যাক—লাভ করুক গ্রাজুয়েশন—তারপর মাষ্টার্স। কিন্তু যারা উচ্চশিক্ষার যোগ্য নয় বা আগ্রহী নয়, কিংবা যাদের রয়েছে অসুবিধা—তারা সেই সার্টিফিকেট, সেই ডিপ্লোমা অথবা গ্রাজুয়েশন নিয়ে স্ব-স্ব পর্যায়ে চাকুরী করুক কিংবা কিছু করে খাওয়ার মত ব্যবস্থা করে নিক। এ ধারাটা শুধু যে ডাক্তারী কিংবা কারিগরি ক্ষেত্রে থাকবে তা নয়। ৮ম শ্রেণীর পরেই নিজ নিজ মেধা ও যোগ্যতা অনুসারেই সবাই বেছে নিবে নিজ পথ—নিজ নিজ পেশা বা নিজ নিজ পেশার বিষয়।

বহু আগেই আমরা এসব পরামর্শ দিয়েছি। কিন্তু অনেক কিছুর মত এব্যাপারেও চলছে হরেদরে সবকিছু করার প্রবণতা। আসলে শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্কুল কলেজের পাঠদান পদ্ধতিতে এমনকি খোদ বোর্ডের মধ্যেও ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও বিশৃংখলা জিইয়ে রেখে শুধু পরিস্থিতির শিকারে পরিণত হয়ে যারা বহিষ্কৃত হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে এরকম কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ কতটা যুক্তিযুক্ত—সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তা আবার ভেবে দেখবার অনুরোধ করছি।